পাহাড়ে ধর্ষণ-হাতিয়ার

উদিসা ইসলাম

আমরা মানে 'বাঙালি'রা যারা বাইরে থেকে পার্বত্য অঞ্চলে যাই, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘুরতে গিয়ে মুগ্ধ হই। মুগ্ধ হই কেবলই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে। সেটা হবারই কথা। কিন্তু আমরা রাজনীতিটা বুঝতে চাই না। বুঝতে চাই না, কারণ আমাদের সেই বাস্তবতাতেই রাখা হয়, যাতে রাজনীতিটা বুঝতে না চাই আমরা। তো সেই রাজনীতিটা না-বুঝে পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখে বলে উঠি, 'ইস, এদেশ আমারও! পাহাড়িদের কারণে এখানে আমাদের অতিথি হয়ে আসতে হয়, বাসিন্দা হতে পারি না।' এই যে বাক্যটা বললাম, সেখানে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার দৃষ্টিতে। এক. এদেশ আমারও। দুই. বাসিন্দা হতে চাওয়া। প্রায় 'নির্দোষ' দুটো চাওয়া। কিন্তু কোনো একটা অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের যে হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার জায়গাটাও তৈরি হওয়া দরকার, এই বিষয়টি একবারের জন্যও ভাবি না। এটা দোষারোপ অর্থে বলা নয়, এটাই হওয়ার কথা। কেননা যে রাজনীতি সেখানে জিইয়ে রাখা হয়েছে, সেখানে ভিন্ন কিছু ভাবার কথা না। ফলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবিশেষকে দোষারোপ করতে এই লেখা নয়। তবে আবারও ওই কথায় আসতে হয়, এদেশ আমারও এবং বাসিন্দা হতে চাওয়ার খায়েশ জাগলে রাজনীতি বুঝে ওঠাটা দায় হয়ে ওঠে।

যারা এই খায়েশ দুটোর মধ্যেই বোঝাপড়া রাখতে চান তাদের উদ্দেশে বলি, রাজনীতিটা মোটেও সূক্ষ্ম না, ভীষণ স্থূল। শুধু জানতে চাইলেই হলো। আর সেখানে জিইয়ে রাখা হানাহানি বুঝতে পারলে পাহাড়কে, পাহাড়িদেরকে দোষারোপ না-করে সিস্টেমটাকে দোষারোপ করতে পারা সম্ভব হবে। যেটা জরুরি। পাহাড়ে সচেতনভাবে বাইরে থেকে যাওয়া বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী হাজারও সমস্যা জিইয়ে রাখে। বলাই বাহুল্য, তাতে ক্ষমতাগোষ্ঠীগুলোর একেকটির একেকরকম লাভ থাকে। যেকোনো সংঘাত তৈরির প্রচলিত কৌশল হিসেবে বলা হয়ে থাকে, পুরুষকে দুর্বল করতে হলে তার পরিবারের নারীদের নির্যাতন করার কথা। আর যুদ্ধে এটা তো সবচেয়ে কার্যকর 'অস্ত্র'। সেই অর্থে 'যুদ্ধ'পরিস্থিতি না-হলেও পাহাড়ে নারীকে নির্যাতন সে ধরনের কৌশল হিসেবেই নেয়া হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা কি এখন অভ্যস্ততায় পরিণত হয়েছে? এই লেখাটা কেবল সেই চিন্তাগুলোকে, প্রশ্নগুলোকে উস্কে দেয়ার জন্য।

এই লেখাটি একেবারেই মাঠে কাজ করার ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের কথা তাদের মুখ থেকে শুনে লেখা। পাহাড়কে দমিয়ে রাখতে

ষাটের দশক থেকে শুরু হওয়া চরম নির্যাতনের ইতিহাস শেষ হয় নি শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়েও। শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়েও বলছি এ কারণে যে, একটা বড়ো অংশের মানুষ মনে করেছিল শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন তো আসেই নি বরং এর ফলে একটা প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নির্যাতনকে হালাল করা সম্ভব হয়েছে। তাতে একটা বড়ো সময়ে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনে হয়েছে— শান্তিচুক্তি হয়েছে, শান্তি নেমেছে পাহাড়ে। আগে গেলে আমরা বাঙালি বিদেশি সবাই গুম হয়ে যেতাম, এখন নিজ দেশের মাটিতে আরামে ঘুরে বেড়াতে পারছি। ঘটনা এতটা সরল নয় এবং পরিস্থিতি যে আদতে পালটায় নি তার প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায় পুরো পাহাড় বাঙালি সেটেলারে ভরে গেছে। যাদের সরকারি অর্থে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে পাহাড়ে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরহারা, নদীভাঙা এই বাঙালিরা রেশনের মাধ্যমে খেয়ে-পরে বেঁচে আছে, কিন্তু তারা জানে না কেন তারা পাহাড়ে। তবে তারা শত্রু হিসেবে পাহাড়িদের চিনে ফেলেছে। কেন? কারণ এই সেটেলারদের চিনিয়ে দেয়া হয়েছে কে বা কারা তার শত্রু। আর কিছু না। কিন্তু যে পাহাড়িদের জন্য শান্তিচুক্তি, তাদের জীবনে শান্তি নামে নি। নিজ এলাকায় এখনো তারা 'অপর' হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে। প্রমাণহীনভাবে নানাসময় তাদের 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়া হচ্ছে। আর নারীরা হচ্ছে নির্যাতিত। অপহৃত কল্পনা চাকমার যেমন খোঁজ মেলে নি যুগ পেরিয়ে গেলেও, তেমন রোজ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে পাহাড়ি কন্যাশিশু, কিশোরী, নারী।

ক্রসফায়ার 'গল্প'

মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশ জানতে পারে একদল সন্ত্রাসী নাশকতামূলক ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যে সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের ভাদালিয়া স্বস্তিপুর গ্রামের আবুল কাশেম মৃধার বাঁশবাগানে মিলিত হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া সদর থানা পুলিশ ও ডিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সন্ত্রাসীরা পুলিশকে লক্ষ করে গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশও পালটা গুলি ছোড়ে। শুরু হয় দুইপক্ষের বন্দুকযুদ্ধ। প্রায় আধঘণ্টা বন্দুকযুদ্ধের একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা পিছু হটে। বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় শহিদুল ইসলাম (২৮)। সে গণমুক্তিফৌজের অস্ত্রধারী কিলার। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ১টি এলজি, ৫ রাউন্ড বন্দুকের গুলি, ৭ রাউন্ড রাইফেলের গুলি, ৫টি বোমা ও ৫টি গুলির খোসা উদ্ধার করেছে। কুষ্টিয়া সদর সার্কেল সিএ হালিম জানায়, সন্ত্রাসী শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ২টি হত্যা, ২টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১টি ডাকাতিসহ ৬টি মামলা রয়েছে।

ধর্ষণ 'গল্প' ১

করুণা ত্রিপুরা (ছদ্মনাম, ১৪) গরু চরাতে গেলে ওত পেতে থাকা স্থানীয় বাঙালি/পুলিশ রানা (ছদ্মনাম) তাকে পার্শ্ববর্তী ছড়া/গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় এবং হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর তাকে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়/ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। এ বিষয়ে স্থানীয় থানায় মামলা হয়েছে/সামাজিকভাবে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা চলছে।

ধর্ষণ 'গল্প' ২

বিনা চাকমা (ছদ্মনাম, ১০) গরু ও গৃহপালিত পশুদের খাওয়াতে গেলে ওত পেতে থাকা আসামি ইব্রাহীম উল্টাছড়ি খামারবাড়ির জমি থেকে ধরে তাকে পার্শ্ববর্তী ছড়া/গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় এবং হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর তাকে ধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলে

রেখে যায়। এ বিষয়ে স্থানীয় থানায় মামলা হয়েছে। এই ইব্রাহীম এর কিছুদিন আগে বিনা চাকমার মামাত বোনকে ধর্ষণের অভিযোগে কারাগারে ছিল। হাইকোর্ট থেকে জামিন নিয়ে এলাকায় ফিরে গিয়ে সে বিনা চাকমাকে ধর্ষণ করে হত্যা করে। ইব্রাহীম জেলে রয়েছে। মামলা চলছে।

ক্রসফায়ারের উদাহরণের এই গল্পটা আমাদের কাছে অতি পরিচিত। আমরা দেখে আসছি ক্রসফায়ারের নানা ঘটনায় একই বিবরণ সাজানো হয়। আর পরের উদাহরণ দুটিতে নানা ঘটনা একইভাবে ঘটলেও, সেগুলো কোনো এজেন্সি সাজিয়ে দেয় না। ঘটনাগুলো এভাবেই ঘটে, ঘটানো হয়। খাগড়াছড়ির ৮ মাইল ত্রিপুরা পাড়ায় গত ১০ বছরে অন্তত ৭টি ধর্ষণের ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে এ ধরনের বিবরণই পাওয়া যায়।

সরেজমিনে খাগড়াছড়ির ৮ মাইল, ৯ মাইল, রাঙ্গামাটির সাজেক, মাটিরাঙা ঘুরে জানা গেছে, এসব এলাকায় ৯ থেকে ৩০ বছরের নারী ও শিশুদের ওপর নির্বিচারে ধর্ষণসহ নানা নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। কেবল এই ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে কয়েক মাসে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এলাকায় পরপর কয়েকটা নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও সেগুলোর মধ্যে এক-দুটি ঘটনার বাইরে বিস্তারিত জানা যায় না। এমনকি পত্রিকায় যে 'সিঙ্গেল-কলাম' বরাদ্দ হয়, সাধারণত, বেশিরভাগ নির্যাতনের ঘটনাই এটুকু জায়গা পর্যন্তও পায় না। দেশের পত্রিকাগুলো নারী নির্যাতনের এইসব সংবাদকে 'সংখ্যালঘু সংবাদ'-এ পরিণত করেছে। নির্যাতন যে নির্যাতনই, তা যেখানেই ঘটুক সেটা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

২০১২ সালের আগস্টে ত্রিপুরা এক কিশোরী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। দুই ধর্ষক (ওই কিশোরীর ভাষ্যমতে) ধর্ষণ করে তাকে জুমঘরে ফেলে রেখে যায়। ধর্ষণের শিকার এই কিশোরী এ-ও বলেন, ধর্ষক স্থানীয় ক্যাম্পের পুলিশ কনস্টেবল। পরে অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, এই ধর্ষক পুলিশ কনস্টেবল মাত্র ৬ মাস আগে চাকরিতে যোগদান করেছে। তার বাড়ি পঞ্চগড় এলাকায়।

শুরুতে ধর্ষণের শিকার মেয়ের মায়ের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনি ১ সেপ্টেম্বর ২০১২। মেয়েটি সে সময় পাশে বসা ছিল।

স্থান : ত্রিপুরাপাড়া, আটমাইল
সময় : সন্ধ্যা ৬টা
আলাপে যাঁরা ছিলেন : উদিসা ইসলাম, আরিফ রেজা মাহমুদ, রিকো চাকমা
কথোপকথনের ভাষা : চাকমা

ধর্ষণের শিকার মেয়েটির মা ঘটনা যেভাবে বললেন সেটা এরকম : মেয়ে অনন্য ত্রিপুরা (ছদ্মনাম, ১১)। সে আর তার ছোটবোন ২১ আগস্ট অটলটিলা পুলিশক্যাম্পের পিছনে গরু চরাতে গিয়েছিল। ছোটবোন গরু নিয়ে একটু দূরে চলে গেলে অনন্যাকে এক পুলিশ জোর করে পাশের জুমঘরে নিয়ে যায়। সে সময় ওই পুলিশটির সাথে আরেকজন পুলিশও ছিল। এরপর প্রথম পুলিশ তাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটি সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলায় তার পরবর্তী কোনো কিছু সে মনে করতে পারে না।

তার সাথে থাকা ছোটবোনটি আগের জায়গায় ফিরে এসে বড়োবোনকে দেখতে না-পেয়ে তিনপাহাড় দূরে তাদের নিজেদের বাসায় ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে বড়োবোনের খোঁজ নিলে জানতে পারে সে

এখনো ফিরে আসে নি। ছোটমেয়ের কাছে মা ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে যান। নাম ধরে ডাকাডাকি করলে একসময় মেয়ের ঘোঙানি শুনতে পান। সেটা একসময় চিৎকার ও কান্নায় রূপ নেয়। সে সময় ওই কুঁড়েঘর থেকে মা মেয়েকে উদ্ধার করে এবং ঘটনা জানতে পারে। মেয়েটি ধর্ষককে চিনতে পারায় দেরি না-করে মেয়েকে নিয়ে মা পুলিশ ক্যাম্পে যান। সেখানে গিয়ে ঘটনা জানালে বড়োবাবু (ইনচার্জ) ক্যাম্পের সব পুলিশকে সেখানে আসতে নির্দেশ দেন। ততক্ষণে ধর্ষক রাসেল রানা পোশাক পালটে এসে সেখানে দাঁড়ায়। ধর্ষণকারীকে শনাক্ত করতে বললে অনন্যা ত্রিপুরা লাল গেঞ্জি পরা রাসেলকে চিনিয়ে দেয়। রাসেলের সারা মুখে সে সময় নখের আঁচড়ের দাগ।

ধর্ষক চিহ্নিত হলে ঘটে আরেক ঘটনা। ক্যাম্প ইনচার্জ ঘটনাটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না-করার অনুরোধ করে অনন্যার মাকে। এ ধরনের ঘটনায় সাধারণত যে উদ্যোগ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নেয়া উচিত, তা না-নিয়ে সালিসের মাধ্যমে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলে। মেয়েটির মায়ের কোনো কথা না-শুনে ক্যাম্প ইনচার্জ ক্ষতিপূরণের জন্য ধর্ষক রানাকে এক হাজার টাকা দিতে বলেন এবং মেয়েটির মাকে সেই টাকা নিয়ে বাসায় চলে যেতে বলেন। এখানেই শেষ না। ঘটনার জন্য অনন্যার মায়ের কাছে রাসেলকে ক্ষমা চাইতে বলেন ক্যাম্প ইনচার্জ। রাসেল নিজের দোষ সবার সামনের স্বীকার করে মেয়েটির মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাইতে আসে। এসময় অনন্যার মা সজোরে লাথি মেরে সেখান থেকে চলে আসেন। তিনি নিজেই বলেন, এ ঘটনার ক্ষমা হয় না। আমি এক হাজার টাকা দিয়ে কী করব? এরপর ক্যাম্প থেকে মেয়েটির মা গ্রামে গিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উল্লিখিত ঘটনা জানান এবং তাদের সহায়তায় থানায় গিয়ে এজাহার করেন।

লক্ষ করুন, ধর্ষক রাসেল সে মুহূর্তে অপরাধ স্বীকার করে নেয় এক হাজার টাকা দিয়ে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করেছে। পরবর্তী সময়ে দুর্বার নেটওয়ার্ক নামে স্থানীয় এক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি দল ধর্ষকের সাথে দেখা করতে গেলে তাদের সামনেও সে তার 'ভুল' স্বীকার করে। তাকে তার অপরাধের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সজল নয়নে ভুল হয়ে গেছে বলেছে সে। কিন্তু এই 'ভুল হয়ে গেছে' বাক্যটা আদৌ কোনো অর্থ বহন করে কি? প্রশ্ন জাগে, এ ধরনের 'ভুল' আদৌ সে সমতলে ঘটাত কি না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাসেলের বিরুদ্ধে গত ২১ বছরের জীবনে কোনো মামলা বা যৌন হয়রানির অভিযোগ নেই। এখন মূল যে প্রশ্নটি বারবার করা উচিত, তা হলো : এই 'ভুল'গুলো কেন পাহাড়ে গিয়েই হয়? সমতলে নিজেকে সামলে রাখার, এ ধরনের ইচ্ছেগুলোকে দমন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকলেও পাহাড়ে গিয়ে তা থাকে না কেন? প্রশ্ন তোলা জরুরি। তাহলে কি সে সেখানে পাহাড়িদের কম ক্ষমতাবান এবং তাদের নারীদের ভোগের পরও কোনো সামাজিক হেনস্থার ভয় নেই (কারণ বাঙালি নির্যাতকের সমাজ সেখানে উপস্থিত নেই এবং তার পাশের রাষ্ট্রকাঠোমো তাকে নিরাপত্তা দেয়), এসব হিসেব কষে তবেই এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়?

এসব প্রশ্ন মাথায় নিয়েই ভাবতে বাধ্য হতে হয়, শেষ পর্যন্ত এই মামলার কি নিষ্পত্তি হবে? অপরাধী কি সাজা পাবে? কেননা বিগত সময়ে ঘটা এ ধরনের যাবতীয় ঘটনা আশান্বিত করে না।

একনজরে : মার্চ ২০০৯ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত শুধু খাগড়াছড়িতে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মোট ২৪টি। এর মধ্যে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ৬টি। এগুলো সেইসব ঘটনা, যেগুলোর মামলা হয়েছে এবং যেসব নির্যাতন ধর্ষণের খবর এলাকার বাইরে এসেছে। এর বাইরেও অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলো জানা যায় না। এই ধর্ষণের ঘটনাগুলোর মধ্যে মাত্র ১৫টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। যার

একটিও আজ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয় নি। আর বাকি ঘটনায় সামাজিকভাবে, গ্রাম্য সালিসে, মামলা না-করে হেডম্যানের মধ্যস্থতায় মীমাংসা হয়েছে।

কথা হয় দুর্বার নেটওয়ার্কের খাগড়াছড়ি জেলার দায়িত্বে থাকা শাপলা ত্রিপুরার সাথে। তিনি বলেন, বড়ো অভিযোগ হলো, শাস্তি না-হওয়া। বেশির ভাগ ঘটনা মামলা পর্যন্ত গড়ায় না। আর মামলা হলে সাজা হয় না। আর যে কিনা একটু সাহস নিয়ে অভিযোগ করতে এগিয়ে আসে, পরবর্তী সময়ে তার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। যেমন ত্রিপুরা মেয়েটির যে ঘটনা, তাদের পুরো পরিবারকে ওই ক্যাম্পের পাশ দিয়েই নিজ গ্রামে যাতায়াত করতে হয়। তাদের পরবর্তী সময়ের নিরাপত্তা কে দেবে? সেহেতু আপনি তাদের মামলা করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না। আরেক দিকে, মামলা যেগুলোর হয়েছে, সেগুলোরও কোনো অগ্রগতি না-থাকায় সেটাও আমাদের জন্য ভীতির সঞ্চার করে।

এসব কথা শুনছি আর আমার চোখে নির্যাতিত মেয়েটির মায়ের ভীত চেহারা ভেসে উঠছে। আমাদের সাথে আলাপ করার সময় বারবার যে প্রশ্নটা তিনি করছিলেন, সেটাই সেখানে তাঁর নিরাপত্তাহীনতার বোধকে মনে করিয়ে দিতে থাকে— 'আমি তো ওই পুলিশকে লাথি মেরেছি। আমার কিছু হবে না তো!'

উদিসা ইসলাম সিনিয়র রিপোর্টার, ঢাকা ট্রিবিউন। udisaislam@gmail.com।